Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 354–361
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

রবীন্দ্র নির্বাচিত ছোটগল্পে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উপকরণের প্রভাব ও প্রয়োগ

রবিন রক্ষিত
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো–বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : rabinrakshit2017@gmail.com

Keyword
প্রাচীন সাহিত্য, গীতগোবিন্দ, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, যাত্রাগান, পাঁচালি

Abstract
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল আজীবন। বহুস্থানে তার প্রভাব ও প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য সাহিত্যিক যেখানে বিদেশী সাহিত্যকে অবলম্বন করেছেন সেখানে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যকে তাঁর পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং তাঁর হস্তে সেই প্রাচীন সাহিত্য যেন পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। বালক কবি প্রথম থেকেই রামায়ণ, মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি স্বীকারও করেছেন যে ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি বৈষ্ণব পদাবলী পড়েছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'চন্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'ভাগবত', 'বৈষ্ণব সাহিত্য', 'শাক্ত সাহিত্য', 'কথকতা', 'পাঁচালি'- যেগুলো গ্রামের চন্ডীমন্ডপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সেগুলিকে তিনি একাত্ম করে নিয়েছিলেন এবং সেগুলিকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন অভিনবভাবে। যার প্রভাব পড়েছে তাঁর গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র সাহিত্য জুড়ে। নতুন মনোভাব, নতুন অনুরাগ, নতুন আন্তরিকতা নিয়ে তিনি দেখলেন পল্লী বাংলার চলমান জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রযুক্তি-বৈচিত্র্য ও বিস্তার বিস্ময়কর। পাঠক হিসেবেই শুধু নয়, শ্রষ্টা হিসেবেও তিনি অনন্য। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করার সাথে সাথে দুর্বোধ্য শব্দকে খাতায় নোট করেও রাখতেন। সে কথা স্বীকারও করেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে। বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা রবীন্দ্রনাথের গল্পে পল্লিনির্ভর প্রাচীন বাংলা সাহিত্য নানাভাবে উঠে এসেছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে তিনি ছোটগল্পের মতো শিল্পকর্মে খুব সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছেলেবেলা থেকেই নিজেদের বাড়িতে যাত্রা গান শোনার অভিজ্ঞতায় যাত্রার অভিনেতাদের সম্পর্কে কৌতুহলী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এর প্রভাব পড়েছে তাঁর 'অতিথি' গল্পে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রয়েছে বাউল গানের প্রসঙ্গ। তাঁর অন্যতম অতিপ্রাকৃত গল্প 'কঙ্কাল' গল্পে মহাভারতের প্রসঙ্গ রয়েছে। 'সমাপ্তি' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ ছড়া-রূপকথার প্রভাবকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের পরিণতির ট্র্যাজেডি করুণ মধুর হয়ে উঠেছে কীর্তন

দলের গানের সার্থক ব্যবহারে। আবার 'নষ্টনীড়' গল্পে রয়েছে কবিকঙ্কন চন্ডী প্রসঙ্গ, মহাভারতের প্রসঙ্গ। 'হৈমন্তী' গল্পে এসেছে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় কাব্য রামায়ণের প্রসঙ্গ। 'রবিবার' গল্পে রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী পদের সার্থক ব্যবহার।

Discussion

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন –

> "সাহিত্য সৃষ্টিতে একাল সেকালের প্রভাব নিয়ে গোঁড়ামিটা মোটেই কোনো কাজের কথা নয়।যুগের মৌলিকতায় বা প্রয়োজনীয়তায় চিন্তার জিনিসগুলি যতই মূল্যবান হোক, সাহিত্যের আসরে পরিবেশনের বেলায় সেগুলিকে রসিয়ে দিতে হবে অনুভূতির মাধুর্যে-এই হল সাহিত্যের একমাত্র দাবি।"[১]

বস্তুত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল আজীবন। বহু স্থানে তার প্রভাব ও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য সাহিত্যিক যেখানে বিদেশী সাহিত্যকে অবলম্বন করেছেন সেখানে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যকে তাঁর পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং তাঁর হস্তে সেই প্রাচীন সাহিত্য যেন পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। বালক কবি প্রথম থেকেই রামায়ণ মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি স্বীকারও করেছেন যে ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি বৈষ্ণব পদাবলী পড়েছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'চন্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'ভাগবত', বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, কথকতা, পাঁচালি- যেগুলো গ্রামের চন্ডীমণ্ডপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সেগুলোকে তিনি একাত্ম করে নিয়েছিলেন এবং আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন অভিনব কৌশলে। যার প্রভাব পড়েছে তাঁর গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে। নতুন মনোভাব, নতুন অনুরাগ, নতুন আন্তরিকতা নিয়ে তিনি দেখলেন গ্রাম বাংলার চলমান জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে। তিনি স্বীকারও করেছেন যে বাউল পদাবলীর প্রতি অনুরাগ তাঁর অনেক লেখায় তিনি প্রকাশ করেছেন। মূলত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ ছিল। এই বইটি তিনি পড়েছেন বারবার। কাব্যটির পাঠ-ক্রিয়া সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতির' 'পিতৃদেব' অংশে জানিয়েছেন–

> "একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো একলাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদ্য জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।আমার মনে আছে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহ' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত-সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল।"[২]

তবে পাঠক হিসেবেই শুধু নয়, স্রস্টা হিসেবেও তিনি অনন্য। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে গীতগোবিন্দের টুকরো টুকরো অংশ বারবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। আবার 'জীবনস্মৃতির' 'শিক্ষারম্ভ' অংশে বলেছেন-

> "এমনি করিয়া নিতান্ত শিশু বয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চানক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস রামায়ণই প্রধান।"[৩]

রবীন্দ্রসাহিত্যে এই প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রযুক্তি-বৈচিত্র্য ও বিস্তার বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যকে নিজস্ব ভাবনার রসে জারিত করে এক অভিনব রূপ দিয়েছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অল্পবয়সী

রবীন্দ্রনাথের মনে দাগ কেটে গিয়েছিল সেগুলি হলো রামায়ণ ও মহাভারত। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করার সাথে সাথে দুর্বোধ্য শব্দকে খাতায় নোট করেও রাখতেন। সে কথাও স্বীকার করেছেন তিনি 'জীবনস্মৃতির' 'ঘরের পড়া' অংশে। তিনি লিখেছেন-

> "শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ্য বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।"[৪]

রবীন্দ্র সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যের এই প্রভাব কখনোই অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। তা মূলত আত্মীকরণ অর্থাৎ প্রভাবকে আয়ত্ত করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা লেখকের উদ্দেশ্য। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথ যা কিছুই গ্রহণ করে থাকুন না কেন, অলৌকিক প্রতিভা দ্বারা তা তিনি নিজস্ব সম্পদ করে তুলেছেন। বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা রবীন্দ্রনাথের গল্পে পল্লী নির্ভর প্রাচীন বাংলা সাহিত্য নানাভাবে উঠে এসেছে। লোকসাধারণের সঞ্জাত ব্রতকথা, রূপকথা, ছড়া, যাত্রাগান, পাঁচালি এমনকি মৈমনসিংহ গীতিকার মতো কাব্যও আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে তিনি ছোটগল্পের মতো শিল্পকর্মে খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। আর এই সূক্ষ্মভাবে প্রভাব ও প্রয়োগ গল্পের পরিমন্ডলকে আরও সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। রবীন্দ্র ছোটগল্পের যে পর্বগুলি দেখতে পাওয়া যায়- সূচনা পর্ব, হিতবাদী পর্ব, সাধনা-ভারতী পর্ব, সন্ধি পর্ব, সবুজপত্র পর্ব, লিপিকা পর্ব, তিন সঙ্গীর পর্ব- এই পর্বগুলির মধ্যে প্রায় প্রত্যেক পর্বের ছোটগল্পে কম-বেশি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উপকরণের প্রভাব ও প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল– 'পোস্টমাস্টার', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'কঙ্কাল', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি', 'দুরাশা', 'মণিহারা', 'হৈমন্তী', 'রবিবার' ইত্যাদি।

রবীন্দ্র 'হিতবাদী' পর্বের 'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮) একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প। রবীন্দ্রনাথ পল্লী পরিবেশকে যে কত নিখুঁত ভাবে দেখেছেন তার বর্ণনায় বাউল গানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এ গল্পে। তিনি লিখেছেন –

> "সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুন্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত- যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন- রতন।"[৫]

গল্পে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে রতনের প্রথম আলাপের প্রেক্ষাপট রচনায় এরকম পরিবেশ গড়ে তোলা লেখকের পক্ষে অনিবার্য ছিল।

'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' (হিতবাদী, ১২৯৮) গল্পে দাক্ষায়নীর পাঠ জগতের পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত কয়েকটি বাংলা কাব্যের উল্লেখ করে। এ গল্পে দাক্ষায়নী মাঝে মাঝে স্বামী তারাপ্রসন্নের লেখা শ্রবণ করে আশ্চর্য ও বিস্মিত হতেন।

> "তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশিদাসের মহাভারত, কবি কঙ্কন চণ্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শুনিয়াছেন। সে সমস্তই জলের মতো বুঝা যায়, এমনকি নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মতো এমন সম্পূর্ণ দুর্বোধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নাই।"[৬]

দাক্ষায়নীর পাঠ্যতালিকায় প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলির উল্লেখের মাধ্যমে দুটি উদ্দেশ্য সাধন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এক- তৎকালীন মধ্যবিত্ত অল্পশিক্ষিত গৃহিণীদের পাঠ পরিচয়ে গল্পের বাস্তবতা রক্ষা করেছেন পুরোমাত্রায়, দুই-প্রাচীন বাংলা

কব্যগুলির তুলনায় তারাপ্রসন্নের সাহিত্য কীর্তির অসারতা প্রথম থেকেই ইঙ্গিতে বলে দিয়েছেন। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী-উপকাহিণীগুলি বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মজ্জাগত হয়েছিল। এই দুই কাব্যের অনেক ছোট ছোট বিষয়কেই তিনি গল্পে উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর অন্যতম অতিপ্রাকৃত 'কঙ্কাল' (সাধনা, ১২৯৮) গল্পেও মহাভারতের প্রসঙ্গের প্রয়োগ ব্যবহার খুব সুকৌশলে চমৎকারভাবে করেছেন। গল্পের নায়িকা নিজের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন –

> "আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে একখন্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারদিক হইতে যেমন আলো ঝকমক করিয়া উঠে আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্য্যের ভঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম- পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে, এমন দুইখানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জুনকে লইয়া দৃপ্ত ভঙ্গিতে আপনার বিজয়রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অস্থুল সুডোল বহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মতো অঙ্গুলি ছিল।"[৭]

অতিপ্রাকৃত গল্পের পরিবেশে এধরনের উপমা প্রয়োগ এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

'সমাপ্তি' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ ছড়া-রূপকথার প্রভাবকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের দেশে বর্গি হাঙ্গামা নিয়ে প্রচলিত বেশ কিছু ছড়া আছে। তার মধ্যে 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এল দেশে/বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে' এ ছড়া সকলের কাছেই পরিচিত। 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ীর দুরন্তপনাকে সেই বর্গির উৎপাতের সঙ্গে তুলনা দিয়ে গল্পকার লিখেছেন –

> "শিশু রাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাটো বর্গির উপদ্রব বললেই হয়।"[৮]

তিনি রূপকথার স্বপ্নজগৎকেও ব্যবহার করেছেন অনন্য দক্ষতায়। চন্দ্রালোকিত রাত্রে ঘুমন্ত মৃন্ময়ীর লেখক বর্ণনা করেছেন-

> "যেমন রাজকন্যাকে কে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়। রূপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে শোনা ছড়া-রূপকথার মোহময় জগৎ পরিণত বয়সে এসেও ভুলতে পারেননি।আলোচ্য গল্পেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তুলে দিয়েছেন এক অনন্য ছড়া- রূপকথার পরিমন্ডল যা গল্পকে আরও রসসিক্ত করেছে।
ব্যক্তিগত জীবনে ছেলেবেলা থেকে নিজেদের বাড়িতে যাত্রাগান শোনার অভিজ্ঞতা থেকেই যাত্রার অভিনেতাদের সম্পর্কে কৌতুহলী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মুক্ত চিত্তে, সিদ্ধ হস্তে সেই যাত্রাগানের প্রসঙ্গকে বারে বারে গল্পে টেনে এনেছেন। বাল্যস্মৃতি রচনায় 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে তাদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে–

> "বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারিদিক থেকে উঠছে তামাকের ধোঁয়া। ছেলেগুলো লম্বা, চুলওয়ালা, চোখে কালিপড়া; অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজ গোজের আসবাব আছে রঙ করা টিনের বাকসোয়।"[১০]

'অতিথি' (সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র যাবতীয় স্নেহ বন্ধন বিমুখ জন্মপথিক তারাপদ 'বিদেশী যাত্রাদলের সহিত' গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। লেখকের ভাষায়—

> "যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগী করিয়া দেয়।"[১১]

কিন্তু তার ঘরছাড়া মন যাত্রাদলেও টেকেনি। দলের অধিকারী এবং অন্যান্য সকলের আদর যত্ন সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন সকলের অগোচরে যাত্রাদল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ক্রমে সঙ্গীতের মোহে আকৃষ্ট হয়ে সে এক পাঁচালির দলে যোগ দেয়।

> "দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল।পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।"[১২]

তারাপদ তার বিচিত্র জীবনে কিছুদিন এক জিমন্যাস্টিকের দলে বাঁশিও বাজিয়েছিল। লেখকের বর্ণনায়-

> "জৈষ্ঠ্যমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ় মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই-তিন দল যাত্রা, পাঁচালি, কবি, নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোট ছোট নদী উপনদী দিয়া এক মেলা অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়।"[১৩]

তারাপদ এই দলেই প্রবেশ করে এবং সর্বশেষ এখান থেকে পালিয়ে নন্দীগ্রামের জমিদার বাবুদের সখের যাত্রাদলে যোগ দেবার জন্য যখন যাত্রা করেছিল, তখনই নৌকাপথে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু এবং তার স্ত্রীর স্নেহাশ্রয় লাভ করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে অনেক প্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তার আয়ত্ত হয়েছিল। বাঁশের বাঁশিতে কীর্তনের সুর বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দেয় সে।

> "পাঁচালি, কথকতা, কীর্তন গান, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খন্ডসকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাবু চির প্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রী কণ্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিল; কুশ লবের কথার সূচনা হইতেছে, এমন সময় তারাপদ উৎসাহ সংবরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, বই রাখুন। আমি কুশ লবের গান করি, আপনারা শুনে যান।"[১৪]

আবার এ গল্পে গ্রামের শুষ্কপ্রায় নদীর নববর্ষার মেঘে ভরে ওঠাকে পার্বতীর পিতৃগৃহে ফিরে আসার সাথে তুলনা করেছেন লেখক। লেখকের বর্ণনায়-

> "গ্রামের নদী একদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোট ছোট নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল এবং শুষ্ক নদীপথে গোরুর গাড়ি চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল- এমন সময় একদিন পিতৃগৃহ প্রত্যাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্য সহকারে গ্রামের শূণ্য বক্ষে আসিয়া সমাগত হইল।"[১৫]

প্রাচীন কাব্য কাহিনীকে এভাবে অভিনব ভঙ্গিতে প্রয়োগের মাধ্যমে লেখকের প্রতিভা বৈচিত্র্যের বিশেষত্বকে আরও বিস্মিত করে।

ছোটগল্পের মতো রূপ-শৈলিতে পরিবেশ সৃষ্টিতে যাত্রাগানের প্রসঙ্গ বারংবার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'মণিহারা' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৫) গল্পে। অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পল্লী গ্রামের বর্ষামুখর রাত্রির বর্ণনা করেছেন এভাবে-

> "উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাত শব্দে যাত্রা গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ যে বাতায়নের উপরে শিথিল কব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে এখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়া ছিল- বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ...গভীর রাত্রে কখন এক সময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে।"[১৬]

গল্পের আবহ বর্ণনায় এভাবে বারবার নানাভাবে যাত্রাগানের প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে –

১. "দেউড়ি বন্ধ করিয়া দারোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল।"[১৭]

২. "শ্রাবণের ধারা তখনও ঝর্ ঝর্ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল,যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।"[১৮]

৩. "তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দারোয়ানেরও ছুটি ছিল।ফণিভূষণ হুকুম দিল... তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে। দারোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।"[১৯]

৪. "অনেক রাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল।"[২০]

'মেঘ ও রৌদ্র' (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১) গল্পের পরিণতিতে যে ট্র্যাজেডি তা করুণ মধুর হয়ে উঠেছে কীর্তন দলের গানের সার্থক ব্যবহারে। জেলফেরত শশীভূষণকে প্রিয়জনই যে আহ্বান করে নিয়ে যাচ্ছে তারই গীতমধুর ব্যঞ্জনা আছে পদটিতে।

> "সেদিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল; পথের প্রান্তবর্তী বর্ষার জল-প্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চঞ্চল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়া ছিল এবং তাহার অদূরবর্তী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোল করতাল যোগে গান গাহিতেছিল - এসো এসো ফিরে এসো- নাথ হে, ফিরে এসো!"[২১]

আবার এ গল্পের শেষে বিধবা গিরিবালার গৃহে টেবিলের উপর ছিন্নপ্রায় ধারাপাত-কথামালার সঙ্গে 'একখানি কাশিরামদাসের মহাভারত'ও চোখে পড়েছিল শশিভূষণের। আবার 'দুরাশা' (বৈশাখ, ১৩০৫) গল্পে বদ্রাওনের নবাবপুত্রী তার হিন্দু দাসীর কাছে শুনত রামায়ণ-মহাভারতের গল্পকাহিনী। এছাড়াও 'নষ্টনীড়' (বৈশাখ–অগ্রহায়ণ, ১৩০৮) গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভূপতি স্ত্রী চারুলতার চিবুক ধরে রসিকতা করে বলেছিলেন-

> "এই আমি যেমন তোমাকে বুঝি, কিন্তু সেজন্য কি 'মেঘনাদবধ' 'কবিকঙ্কন চন্ডী' আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে।"[২২]

এরকমই এ গল্পে মহাভারতের উপমাও সুন্দরভাবে লেখক প্রয়োগ করেছেন সপ্তম পরিচ্ছেদে যখন চারুর ওপর রাগ করে অমল মন্দার কাছে পড়তেছিল-

> "অভিমন্যু যেমন গর্ভবাসকালে কেবল ব্যূহপ্রবেশ করিতে শিখিয়াছিল, ব্যূহ হইতে নির্গমন করতে শেখে নাই।"[২৩]

আবার এ গল্পের দশম পরিচ্ছেদে ভারতচন্দ্রের একটি প্রবাদ-প্রতিম উক্তির বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। আর্থিক সঙ্কটে বাইরের লক্ষ্মী যখন ভূপতিকে ছেড়ে গেছে, তখন ঘরের হৃদয় লক্ষ্মীর আশ্রয় প্রার্থনা তার কাছে একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

> "সেদিন ভূপতির নিজের কিছু দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিক্ত হস্তে চারুর নিকটে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। ...কিন্তু 'হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া', এক মুহূর্তের প্রয়োজনে প্রীতিভান্ডারের চাবি চারু যেন কোনোখানে খুঁজিয়া পাইল না।"[২৪]

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রবাদটিকে রবীন্দ্রনাথ এখানে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করেননি। 'অন্নদামঙ্গলের' প্রথম খন্ডে 'শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ' অধ্যায়ে তার সম্পূর্ণ রূপটি ছিল এরকম-

> "হাভাতে যদ্যপিচায় সাগর শুকায়ে যায়
> হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।"[২৫]

'হৈমন্তী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, সবুজপত্র) গল্পে এসেছে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় কাব্য রামায়ণের প্রসঙ্গ। গল্পের কথককে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন–

> "যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রী পরিত্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।"[২৬]

কথকের এই আত্মবিশ্লেষণ আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বংশ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে ব্যক্তিকে বিসর্জন দেবার শিক্ষাই পুরুষের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে।

'অধ্যাপক' (১৩০৫) গল্পে নায়ক মহিন্দ্রকুমারের মনোবিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাংশকে যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি বিদ্যাপতি-লছিমার প্রেম কাহিনীর উল্লেখও লক্ষ্য করা গেছে। মহিন্দ্রকুমার শুধু প্রবন্ধ লেখা বা বক্তৃতা করায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি নাটকও লেখেন। তাঁর একটি নাটকের নাম বিদ্যাপতি–

> "রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমা দেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালোবাসিতেন এবং তাঁহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্ম অবলম্বন করিয়া আমি একখানি পরম শোকাবহ উচ্চ শ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম।"[২৭]

মহীন্দ্রকুমার প্রথম অনাত্মীয় নারীর সংস্রবে আসেন কিরণের সঙ্গে যোগাযোগে। কিরণের প্রতি মুগ্ধতায় তিনি বৈষ্ণব পদাংশ মনে মনে আবৃত্তি করেন। গল্পকার তাঁর মনের সুরের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন–

> "কিরণ যদি সহজ সুরে বলিত, 'মহীন্দ্রবাবু, কাল সকালে আসবেন তো ?' তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত-
> কি মোহিনী জান, বন্ধু, কি মোহিনী জান!
> অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা- হেন!
> আমি সহজ কথায় উত্তর করিতাম, কাল আটটার মধ্যে আসব। তাহার মধ্যে কিরণ কি শুনিতে পাইত না -
> পরানপুতলি তুমি হিয়ে-মণিহার,
> সরবস ধন মোর সকল সংসার।"[২৮]

গল্পের নায়কের মনের ভাব প্রকাশে প্রথম পদাংশটি রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের লেখা থেকে নিয়েছেন। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন বসন্তরায়ের 'ধনি তুয়া কিসের গঞ্জনা' (পদকল্পতরু) পদ থেকে।

'রবিবার' (আশ্বিন, ১৩৪৬) গল্পে কলেজের মধ্যে অভীকের প্রতি বিভার অনুরাগপূর্ণ সংলাপ শুনে পাশের বারান্দা থেকে বিভার এক সখী টিপ্পনী কেটেছিল জ্ঞানদাসের 'আত্মনিবেনের' পদ উদ্ধৃত করে–

> "মরি মরি, তোমার গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারি রূপে।"[২৯]

অভীকের প্রতি ভালোবাসায় বিভার মগ্ন আত্মনিবেদন রবীন্দ্রনাথ যেন এই একটি পঙক্তি দিয়েই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই গল্পে রামপ্রসাদের 'মা মা বলে আর ডাকব না/ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা' ইত্যাদি পদের ভাবের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে অভীকের মুখে।নাস্তিক অভীককে বিভা বলেছে- 'সুন্দরী মেয়েদের বেলাতেই বিধাতাকে মান বুঝি'। অভীক এর উত্তরে বলেছে –

> "নিন্দে করবার দরকার হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করতে হয়। দুঃখের দিনে যখন অভিমান করবার তাগিদ পড়েছিল তখন রামপ্রসাদ মাকে খাড়া করে বলেছিলেন, তোমাকে মা বলে আর ডাকব না। এতদিন ডেকে যা ফল হয়েছিল, না ডেকেও ফল তার চেয়ে বেশি হবে না, মাঝের থেকে নিন্দে করবার ঝাঁজটা ভক্ত মিটিয়ে নিলেন। আমিও নিন্দে করবার বেলায় বিধাতার নাম নিয়েছি।"[৩০]

আবার অভীক একসময় বিভার সঙ্গে কথোপকথনে শিব ও নন্দীভৃঙ্গীর প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে আসে –

> "সেকালের বুড়ো শিব চোখ বুজে বসেছেন ধ্যানে, একালের নন্দীভৃঙ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যঙ্গ করছে- যাকে বলে debunking। জন্মেছি এ কালে বোম ভোলানাথের চেলা হয়ে কপালে চোখ তুলে বসে থাকতে পারব না; নন্দীভৃঙ্গীর বিদঘুটে মুখভঙ্গির নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে।"[৩১]

এভাবেই প্রাচীন কাব্য-কথা, গল্প-কথা, রূপকথার ভান্ডার চিরনতুন হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে নতুন যুগের নতুন প্রেক্ষাপটে।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, বিশ্বনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নতুন পা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ১৯
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৫০
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১২
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী, কলকাতা,কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৭২
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ২৪
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ , মালা পাবলিকেশন , কলকাতা,পৃ. ৪১
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন , কলকাতা, পৃ. ৬৬
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন , কলকাতা, পৃ. ১৮৩
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন , কলকাতা, পৃ. ১৯৩
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছেলেবেলা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ.-
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩০৯
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩১০
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩১০
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩১২
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩১৯
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৭৬
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৭৭
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৭৭
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৭৭
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৭৮
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ২২৮
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৪৩১
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৪৪০
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৪৪৬
২৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলেন্দু, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৪-২০১৫, পৃ. ১৮৫
২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৬১২
২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৪৭
২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৫৭
২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৭৩০
৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৭৩৪
৩১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, মালা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৭৩৬